মঞ্জু সরকারের ছোটোগল্প : নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতা

লোকমান কবীর*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের ছোটোগল্পে মঞ্জু সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর গল্প মূলত উত্তরবঙ্গের মঙ্গা বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত মানুষের জীবনাখ্যান। তবে জীবিকার্জনের জন্য শহরে বাস করা নিম্নবর্গের জীবনচিত্রও তাঁর গল্পের অন্যতম উপকরণ। তাঁর রূপায়িত নিম্নবর্গ ক্ষমতাকাঠামোয় প্রান্তিক, খাদ্যাভাবে ক্ষুধার্ত, উচ্চবর্গের নিপীড়নে বিপন্ন, দারিদ্র্যের পীড়নে বিপর্যস্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর বিপন্নতা আরও অধিক। উচ্চবর্গের নানা চাপে নিষ্পেষিত এসব নিম্নবর্গ কখনো প্রতিবাদী কখনো বা অপরাধপ্রবণ। নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতার বহুবর্ণিল চিত্রের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনে তিনি অর্জন করেছেন শৈল্পিক বিশিষ্টতা। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য মঞ্জু সরকারের গল্পে প্রতিফলিত নিম্নবর্গের জীবনের বিচিত্র চালচিত্রকে উন্মোচিত করা; এবং নিম্নবর্গের জীবন রূপায়ণে লেখকের দক্ষতা বিচার করা।]

নিম্নবর্গ প্রত্যয়টি মূলত উচ্চবর্গের সঙ্গে ক্ষমতাকাঠামো দ্বারা সম্পর্কিত। সাধারণত উচ্চবর্গের তুলনায় ক্ষমতাকাঠামোর নিম্নে থাকা শ্রেণিকে বলা হয় নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গ শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয় ইতালীয় 'সুবলতের্নো' এবং ইংরেজি 'সাবঅল্টার্ন' (Subaltern) শব্দের পরিভাষা রূপে। ইংরেজি 'সাবঅল্টার্ন' শব্দটির বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায় সামরিকবাহিনীর ক্ষেত্রে। সেখানে ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদেরকে বলা হয় 'সাবঅল্টার্ন'। "তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত " (পার্থ, ২০০৮ : ২)। আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) *প্রিজন নোটবুকস* (১৯৫০) গ্রন্থে সর্বপ্রথম নিম্নবর্গ (সুবলতের্নো) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মুসোলিনির কারাগারে বন্দি থাকাকালে (১৯২৯-১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) মার্কস কথিত প্রোলেতারিয়েত শ্রমিক শ্রেণিকে নিম্নবর্গ হিসেবে উল্লেখ করেন (মেহেদী, ২০০৮ : ১৮)। নিম্নবর্গের ঠিক বিপরীতেই তিনি 'হেজেমনিক' বা আধিপত্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণির অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন। তবে গ্রামশি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ছাড়াও, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বে নিম্নবর্গ শ্রেণির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রামশির রচনায় বিশ শতকের শুরুর দিকে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে সামন্ত শ্রেণি কর্তৃত্ব ও কৃষক শ্রেণির অধীনতার সাধারণ চরিত্রই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি আধিপত্য ও অধীনতার বৈশিষ্ট্য সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে এক প্রান্তে অবস্থান করে প্রভুত্ববিস্তারকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি, আর তার বিপরীত মেরুতে বাস করে তাদের অধীন 'সাবঅল্টার্ন' শ্রেণি (পার্থ, ২০০৮ : ৩)। গ্রামশির ব্যবহৃত বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে প্রেরণা নিয়ে 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব হলেও ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসকে উপজীব্য করেই এই ধারণার প্রয়োগ ও বিস্তার ঘটেছে। এমনকি মার্কসবাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার জায়গায় প্রশ্ন তুলেই নির্মিত হয়েছে নিম্নবর্গ ধারণার প্রেক্ষাপট।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে নিম্নবর্গের ধারণা মার্কসবাদীদের উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণার বিকল্প কোনো ধারণা নয়, বরং ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের প্রয়োজনে, শ্রেণিদ্বন্দ্বের অসমান্তরাল বিকাশকে চিত্রিত করার জন্য এটি হচ্ছে উৎপাদনসম্পর্কের সম্পূরক ধারণা। (পার্থ, ২০০৮ : ৭) তাই নিম্নবর্গের ধারণা নির্মিত হওয়ার কারণে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির কয়েকটি নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচিত হয়েছে।

রণজিৎ গুহ 'সাবঅল্টার্ন'-এর বাংলা পরিভাষা রূপে 'নিম্নবর্গ' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন । (পার্থ, ২০০৮ : ২) তাঁর দেওয়া তথ্য ও যুক্তি থেকে জানা যায়, ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তা উচ্চবর্গের দ্বারা লিখিত ইতিহাস। সেখানে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দৃশ্যমান এবং নিম্নবর্গের অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি-ধর্মচেতনা ইত্যাদির অন্তর্গত স্বরূপ উপেক্ষিত। ফলে দেখা দেয় নিম্নববর্গের স্বতন্ত্র ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা। সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তীর মতে নিম্নবর্গের এই ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য হলো, "To make the subaltern the sovereign subject of history, to listen to their voices, to take their experience and thought" (Dipesh, 2000 : 102)।

তবে নিম্নবর্গের এই ইতিহাস নিম্নবর্গ নিজে লিখতে পারেনি। এই ইতিহাসচর্চাও শুরু হয়েছে শিক্ষিত উচ্চবর্গের মাধ্যমে। এ কারণে উচ্চবর্গের লিখিত ইতিহাসে নিম্নবর্গের সঠিক ইতিহাস উঠে আসতে পারে কি-না, সে বিতর্ককে সামনে রেখে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'Can the Sualtern Speak?' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গ নিজের কথা নিজে না বলতে পারলেও কিংবা ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচিত না হলেও, সময়ের প্রয়োজনে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে। তিনি প্রবন্ধটির শেষাংশে বলেছেন : If, in the context of colonial prodution, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow (Gayatri, 1988 : 28)।

গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রত্যাশা করেছিলেন নিম্নবর্গের এমন এক ইতিহাস, যেখানে তাদের 'কথা' উঠে আসবে গুরুত্বের সঙ্গে। রণজিৎ গুহ ও অন্যান্য তাত্ত্বিকরা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা শুরু করলে গায়ত্রী চক্রবর্তীর অভীপ্সা বাস্তবে রূপ নেয়। রণজিৎ গুহদের নিম্নবর্গ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস যেমন আলোর মুখ দেখে, তেমনি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিচিত্র দিক সম্পর্কেও জানা যায়।

গ্রামশির মতো রণজিৎ গুহও নিম্নবর্গের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য অধীনতা ও আধিপত্য, এই বিপরীত যুগ্মপদকে গ্রহণ করেছেন। নিম্নবর্গ সবসময় উচ্চবর্গের অধীন এবং উচ্চবর্গ আধিপত্য বিস্তারকারী শ্রেণি। এমনকি বিদ্রোহকালেও নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের অধীনেই থাকে। রণজিৎ গুহ ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে দেশি-বিদেশি-সরকারি-বেসরকারি প্রভুশক্তিকে উচ্চবর্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এই কর্তৃত্ববাদী উচ্চবর্গের বাইরে সকল ব্যক্তি কিংবা 'সমূহ'কে বিবেচনা করেছেন নিম্নবর্গ হিসেবে। ফলে দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব 'জনতা', আদিবাসী, নিম্নবর্ণ, এমনকি নারীরাও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

নিম্নবর্গের ইতিহাস সাম্প্রতিককালে চর্চিত হলেও, বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটোগল্পকারদের গল্পে নিম্নবর্গের জীবনচিত্রকে নানা বর্ণে ও রেখায় চিত্রিত হতে দেখা যায়। মঞ্জু সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ গল্পেই নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য প্রাধান্য পেয়েছে। জন্মস্থান রংপুরের নিম্নবর্গকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন খুব কাছ থেকে। তাই এই অঞ্চলের দরিদ্র-দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রান্তিক মানুষ তাঁর মূল উপজীব্য। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের জীবনকে কেন্দ্র করেও রচনা করেছেন অনেক শিল্পসফল ছোটোগল্প। এসব গল্পে শিল্পিত হয়েছে নিম্নবর্গের জীবনের বিচিত্র প্রান্ত ও প্রবণতা।

নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা : দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-দীর্ণতা ও অধীনতার চিত্র

নিম্নবর্গের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এবং সামাজিকভাবে উচ্চবর্গের নিকট অসম্মানের পাত্র। এই অর্থনৈতিক দৈন্য ও সামাজিক অধস্তনতা তাদেরকে পরিণত করে উচ্চবর্গের অধীন শ্রেণিতে। আবার অর্থনৈতিক অসামর্থ্য তাদেরকে অনেক সময় করে তুলে দুর্ভিক্ষপীড়িত। মঞ্জু সরকারের ছোটোগল্পেও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল, দারিদ্র্যজীর্ণ নিম্নবর্গের অধীনতার বহুমাত্রিক দিক পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রাম ও শহর–উভয় অঞ্চলের নিম্নবর্গের জীবনচিত্রকে ধারণ করলেও মঞ্জু সরকারের গল্পে মূলত গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনযুদ্ধের শক্তিশালী চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের দুর্ভিক্ষকালীন জীবনবাস্তবতার নান্দনিক উপস্থাপনে তিনি অর্জন করেছেন শৈল্পিক বিশিষ্টতা। মঞ্জু সরকারের জন্মস্থান রংপুর ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন জেলায় নিম্নবর্গের মৌসুমি দুর্ভিক্ষ 'মঙ্গা' নামে পরিচিত। মৌসুমী বেকারত্ব ও খাদ্যসংকটের ফলে সৃষ্ট মঙ্গার কারণ ও রংপুরের গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবনে এর বিধ্বংসী প্রভাবের বহুবর্ণিল চিত্র মঞ্জু সরকারের গল্পের প্রাণশক্তি জোগায়। ১৯৭৯ সালে রংপুরের এক দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আনু মুহাম্মদ বলেন :

> রংপুরের লোকসংখ্যা প্রায় ৫৮ লাখ। এর মধ্যে শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ ভূমিহীন দিনমজুর। এখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প না থাকার ফলে এদের প্রায় সবাইকেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। কাজেই প্রতিবছরই এদেরকে মৌসুমী বেকারত্বে পতিত হতে হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাস এমনই দু'মাস যে দু'মাসে প্রথাগত নিয়মে কৃষিতে কাজ থাকে না যার ফলে ভূমিহীন যারা তারা নিজেদের ক্রয়ক্ষমতা সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলে। ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ এবং বার্ষিক সংকটে হারানোর পর অবশিষ্ট সম্পদও অনেকে (ঘর ভিটে, বাসনকোসন ইত্যাদি) এবার হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। এদের মধ্যে সৌভাগ্যবান অংশ কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে নিজেকে কোন রকমে ধরে রাখে, বাকিরা দিনের পর দিন অনাহারে থেকে পরবর্তী সময়ে কাজের ক্ষমতাও হারাতে থাকে এবং অতিষ্ঠ হয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অবাধে মৃত্যুবরণ করে। প্রথমে বৃদ্ধ, শিশু, তারপর অকালবৃদ্ধ নারী পুরুষ। (আনু, ১৯৭৯ : ৬৭-৬৮)

মঞ্জু সরকার রচিত 'প্রিয় দেশবাসী' গল্পে আনু মুহাম্মদের প্রতিবেদনের মতোই মঙ্গার বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়ে বৃদ্ধ আমানুল্লাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হতে দেখি। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ আমানুল্লার স্বজনদের স্বার্থপর ও আত্মসর্বস্ব হতে বাধ্য করেছে। তাই মুমূর্ষু ও অচেতন আমানুল্লাকে মৃত ভেবে, শোকার্ত হওয়ার পরিবর্তে, তার নাতিরা আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, উপার্জনে অক্ষম, অন্ন ধ্বংসকারী একজন ব্যক্তি তাদের সংসার থেকে কমে গেল। ফলে আমানুল্লার নাতিরা নির্দ্বিধায় বলতে পারে : "ও বুড়া মইলে তো ন্যাটা যায়" (মঞ্জু, ২০০৯ :

৭)। কিন্তু অচেতন আমানুল্লার মৃত্যু হয় না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের সুখস্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আমানুল্লা বেঁচে যায়। তিস্তাপাড়ের লোকালয়ে জনসভা করতে এসে, কালো চশমা পরিহিত হাস্যোজ্জ্বল রাষ্ট্রপতি, আমানুল্লাকে ক্ষণিকের জন্য আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিলেন। ফলে সে সময় গ্রামবাসীর কাছে বেড়ে গিয়েছিল তার সামাজিক সম্মান। কিন্তু গ্রামবাসীর কাছে সাময়িক সম্মানবৃদ্ধি আমানুল্লার দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। এমনকি গল্পের শেষে গ্রামের মেম্বারের কাছে দশ টাকা ধার চেয়েও সে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপর ক্ষুধার্ত-দুর্বল আমানুল্লা বাড়ি ফেরার পথে যখন পানি-ভরা ধানক্ষেতে পড়ে গিয়ে বিপন্ন বোধ করে, তখনও তাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসে না। বাঁচার জন্য আমানুল্লা যখন আর্তচিৎকারে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তোলে, তখনও রেডিওতে প্রচারিত হয় রাষ্ট্রপতির প্রতিশ্রুতিময় ভাষণ। এই দৃশ্য প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভণ্ড উচ্চবর্গ মিথ্যা আশ্বাসের মরীচিকায় নিম্নবর্গকে শুধু মোহগ্রস্তই করে; তাদের জীবন বাঁচাতে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

'কার্তিকের অতিথি' গল্পে কার্তিক মাসের মঙ্গায় কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয় মনতাজ। কিন্তু কাজ না পেয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে হয় তাকে। গ্রামের স্টেশনে নামার পর বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠার অপরাধে মনতাজের শেষ সম্বল কয়েকটি টাকা আত্মসাৎ করে স্টেশনের টিকিটচেকার। নিঃস্ব-রিক্ত মনতাজ বাড়ি ফিরে দেখতে পায় দুর্ভিক্ষপীড়িত রুগ্ন স্ত্রী-সন্তানের কঙ্কালসার দেহ, ছিন্ন বস্ত্র। অভাবের তাড়নায় কন্যা আছিয়া সম্ভ্রম বিক্রি করলেও, স্ত্রী-কন্যার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণে ব্যর্থ মনতাজকে বাস্তবতা মেনে নিয়ে প্রতিক্রিয়াহীন থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও 'টেস্ট রিলিফের' গম পাওয়ার মধ্য দিয়ে মনতাজের মতো নিম্নবর্গের মানুষকে মঙ্গা মোকাবেলার উপায় খুঁজে নিতে হয়। মঞ্জু সরকারের অন্যান্য গল্পে শরৎ ও হেমন্তকালীন দুর্ভিক্ষের চিত্র বিধৃত হলেও 'ভূতের সাথে যুদ্ধ' গল্পে বর্ষাকালীন মঙ্গার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মফিজ মাছ ধরার কাজে সমগ্র গ্রামের মধ্যে সুদক্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। "মাছের সাথে এমন নিবিড় সম্পর্কের কারণে গ্রামে তার নামকরণ হয়েছে মাছুয়া মফিজ" (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ২)। সে বর্ষার মঙ্গায় অসুস্থ স্ত্রীর ওষুধ জোগাতে ব্যর্থ। তিনদিন ধরে সপরিবারে অর্ধাহারে থাকা মফিজ প্রচুর মাছ ধরে, কিন্তু তা বাজারে বিক্রি করে মাত্র আধাসের আটা কিনতে পারে। কারণ মঙ্গার শিকার দরিদ্র মানুষ যেখানে ক্ষুধা নিবৃত্তির মতো ন্যূনতম খাদ্য কিনতে পারে না, সেখানে মাছ কিনতে যাওয়া তাদের কাছে বিলাসিতারই নামান্তর। অভাবের কারণে গ্রামের দেওয়ানের শহরবাসী মেয়ে-জামাইয়ের দাসী-বাদীর কাজ করতে বড় মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয় সে। "খেতে দেবে, পরতে দেবে, সময় হলে একটা বিয়েও যেন দেয়– এই বাড়তি অনুরোধটুকু করার পর মেয়েকে বড়লোক শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর মতোই নিশ্চিন্ত হয়েছে মফিজ" (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ২–৩)। ছোটো মেয়ে ও ছোটো ছেলেকে নিয়ে অনাহারে থাকার পর অনন্যোপায় হয়ে দুর্বল শরীরেই তাকে চরক বিলে মাছ ধরতে যেতে হয়। মাছ ধরতে যাওয়ার পর তীব্র বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায় জীবনীশক্তি কমে যাওয়ায় মফিজ বিশ্বাস করে অদৃশ্য কোনো ভূত তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। "যে ভূত অদৃশ্য-অস্পৃশ্য, হয়তো বা অস্তিত্বহীনও, তারই সঙ্গে অসম মোকাবিলায় এবং পরিণতিতে তোয়াজ-তোষণে অক্ষম দারিদ্র্যের নিরুপায় আত্মসমর্পণের কথকতাই গল্পটিতে রূপকার্থিক ব্যঞ্জনায় প্রতিভাসিত" (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৩৯০)।

মঞ্জু সরকারের *মৃত্যুবাণ* গ্রন্থের 'গ্রাস' গল্পেও দরিদ্র দিনমজুরের দুর্দশা ও বিড়ম্বনার চিত্র বিম্বিত হয়েছে। গল্পটিতে একসময়ের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি আকিমুদ্দি ভরসা বিলাসী জীবনযাপন করতে গিয়ে পরিণত হয় নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ নিম্নবর্গে। কিন্তু চালচলনে উচ্চবর্গের আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য সে দরিদ্র ছেলেদের সঙ্গে দিনমজুরের কাজ করতে সে অস্বীকৃতই হয় না, তাদেরকে 'চাষা-ভুষা' বলেও ভর্ৎসনাও করে। উচ্চবর্গের আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য সে অভাব সত্ত্বেও পুরোনো চা খাওয়ার অভ্যাসটা ধরে রাখে। কিন্তু উচ্চাভিলাষী জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় অকিমুদ্দি ভরসা স্ত্রী-সন্তান কাউকেই না জানিয়ে গোপনে চেয়ারম্যানের কাছে জমি বিক্রি করে। এরপর অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা ভরসা খুন হলে, পুলিশ এসে খুনের দায়ে মৃত ভরসার ছেলেদেরকেই গ্রেফতার করে। উচ্চবর্গশাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় ক্ষমতাকাঠামোর উপরের স্তরের পুলিশ ও চেয়ারম্যান একে অপরেরর সহযোগিতায় নিম্নবর্গের ওপর তাদের আধিপত্যকে সক্রিয় রাখতে পেরেছে।

'আবরণ' গল্পের খালেক মিয়াও আকিমুদ্দি ভরসার মতো জাত্যাভিমানী ও আত্মপ্রতারণাকারী নিম্নবর্গ। সমাসন্ন মঙ্গাতেও বাড়ির লুপ্ত বংশগৌরবকে সর্বান্তকরণে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট সৈয়দ বংশজ এই নিঃস্ব সন্তান। তবে যতই বংশগৌরব রক্ষার প্রচেষ্টা চালাক না কেন দর্জির পেশায় নিয়োজিত থাকায় গ্রামবাসীদের কাছে তার নাম খালেক মিয়া থেকে খালেক খলিফায় রূপান্তরিত হয়। সেলাই মেশিন কেনার সামর্থ্য না থাকায় মাসিক একশ টাকা ভাড়া দিয়ে গ্রামের 'নব্য ধনী' নজব মণ্ডলের সেলাই মেশিন ব্যবহার করে এবং তার দোকানে বসে অন্যের জামা-কাপড় সেলাইয়ের সুযোগ পায়। "মঙ্গার দুঃসহ পীড়ন এবং অন্নবস্ত্রাভাব সত্ত্বেও জাত্যভিমানী খালেক পর্দা, সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষার আত্মপ্রতারণায় অস্তিত্বকামী" (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৩৯২)। কিন্তু গল্পের উপান্তে একটি নতুন শাড়ির বিনিময়ে নজব মণ্ডলের সঙ্গে স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ককে আবিষ্কার করে খালেক মিয়া। এরপর নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে তার সম্ভ্রম ও বংশগৌরব রক্ষার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়। বস্তুত মঙ্গার সর্বগ্রাসী পীড়নে পরাজিত ও ক্ষত-বিক্ষত সদ্‌বংশের গৃহস্থের 'জায়াজীবী'তে পরিণত হওয়ার মর্মান্তিক চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে গল্পটিতে।

কার্তিকমাসী মঙ্গা কীভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষকে শহরমুখী করে তোলে তার উজ্জ্বল উদাহরণ মঞ্জু সরকারের 'দুর্গত অঞ্চলের দেবতা'। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নঈমদ্দি অভাবের কারণে জমিজমা বিক্রি করা নিম্নবর্গ। প্রথমে ভূমিহীন দিনমজুর, পরে ভ্রাম্যমাণ দোকানদারি করেও মঙ্গার বিভীষিকাকে দূর করতে পারে না সে। তাই তাকে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে মঙ্গা মোকাবিলার উপায় খুঁজতে হয়। কূটকৌশলের মাধ্যমে গ্রাম্য গৃহবধূ ও শিশুদের কাছে অল্প দামের মনোহারি জিনিস অধিক দামে বিক্রি করার পদ্ধতি বের করলেও, মঙ্গার কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় তার দোকানের উপযোগিতাও অবশিষ্ট থাকে না। ফলে কন্যা নসিফাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শহরে কাজ করতে পাঠায় সে, নিজেও শামিল হয়ে যায় ত্রাণসন্ধানী মানুষের দলে এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে গ্রামের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সপরিবারে রওনা দেয় শহরের উদ্দেশ্যে। এভাবেই দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রলয়ে বিপর্যস্ত হয়ে নঈমদ্দির মতো গ্রামীণ নিম্নবর্গরা জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হতে বাধ্য হয়।

মঞ্জু সরকারের 'রাঘব বোয়ালের খাদ্য' গল্পের ওসমান নদীভাঙনে নিঃস্ব একজন গ্রামীণ নিম্নবর্গ। সে এতটাই দরিদ্র যে, স্ত্রীর মৃত্যুতেও কাফনের কাপড় কেনার ক্ষেত্রে তাকে আমরা সামর্থ্যহীন

ও অক্ষম ব্যক্তিরূপে আবিষ্কার করি। তবে গ্রামবাসীর কাছে কাফনের কাপড় কেনার জন্য সাহায্য তুললেও অভাবের তাড়নায় স্ত্রীকে বিনা কাফনে কবর দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করতেও তার বিবেকে বাঁধে না। বড়ো আকৃতির বোয়াল মাছ ধরে বিক্রি করার আশায় সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে যায়। ছোটোমাছকে খাদ্যটোপ বানিয়ে রাঘব বোয়াল শিকারের আশায় নদীতে যাত্রাপথে ক্ষুধার্ত দুই ছেলেকে বুকে ও কাঁধে নিয়ে হাঁটার সময় সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। "তিনটি প্রাণীর ক্ষুধার ভার দু'টি পায়ে ভর করায় ওসমানের পা টলে। আরো দ্রুত হাঁটতে চায় সে। কিন্তু কোথায় গেলে, কোনদিকে হাঁটলে দ্রুত মুক্তি পাবে? ওসমান তা জানে না। হঠাৎ তার মনে হয়, রাঘব বোয়ালের খাদ্য এঁদো ডোবার চ্যাং মাছগুলো পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সন্তানসহ তাকে কেউ যেন অদৃশ্য থেকে বড় বড়শিতে গেঁথে বন্দী করে ফেলেছে, এক্ষুণি ভয়ঙ্কর মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে ফেলবে" (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ৮৫)। রাঘব বোয়াল-শিকারী ওসমানের মতো নিম্নবর্গের মানুষ এভাবেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের আক্রমণে বিপদাপন্ন হয়ে যায় বলেই দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ ক্ষুধাকে লেখক এই গল্পে তুলনা করেছেন রাঘব বোয়ালের সঙ্গে, আর ওসমানের মতো মানুষকে তাদের খাদ্য রূপে।

নিম্নবর্গের করুণ-কঠোর-বিপন্ন-বেদনার্ত বাস্তবতার নান্দনিক শিল্পরূপ লক্ষ করি মঞ্জু সরকারের 'দুশমন' গল্পে। এই গল্পের নায়ক হাকিমুদ্দি হতদরিদ্র কৃষক। "প্রথম যৌবনে দেওয়ানীর পরামর্শ মতো সম্পত্তি নিয়ে বোন-ভগ্নিপতির বিরুদ্ধে মামলা করেছিল সে। সেই মামলা থেকেই তার কপালভাঙার সূচনা" (মঞ্জু, ১৯৯০ : ২৯)। জমি বন্ধক রেখে হালের গরু কিনতে গিয়ে সুচতুর দালালের কাছে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা এই 'কপালভাঙা' নিম্নবর্গ চাষির জন্য যেমন বেদনাদায়ক, তার চেয়েও মর্মন্তুদ স্বার্থান্ধ হয়ে রাতের অন্ধকারে জমি বিক্রির টাকা চুরি করার জন্য পুত্র হবির চুপি চুপি হাকিমুদ্দির ঘরে প্রবেশ। তারপর অন্ধকারে ভুলক্রমে দুশমনের অনুপ্রবেশ মনে করে দা দিয়ে কুপিয়ে পিতা হাকিমুদ্দি কর্তৃক পুত্র হবিকে খুন করার ঘটনা গল্পে সৃষ্টি করে ট্রাজেডির আবহ। পিতা-পুত্রের জীবনে সংঘটিত এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে সৃষ্ট তাদের স্বার্থসচেতনতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অমোঘ নিয়তিকেই দায়ী করা যায়।

নাগরিক নিম্নবর্গের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং নষ্ট মানুষের রোষানলে পড়ে সংকটাপন্ন অবস্থার চিত্র রূপায়িত হয়েছে মঞ্জু সরকারের 'উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা' গল্পে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বাচ্চু। সে গুলিস্তান হকার্স মার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নূর মোহাম্মদ ঠাণ্ডুকে 'নগদ তিরিশ হাজার টাকা সেলামি' দিয়ে ছোট্ট একটি দোকান বরাদ্দ পায়। যদিও হকার্স মার্কেট সরকারি জায়গা, তবুও ঠাণ্ডুকে চাঁদা দিতে হয়। কেননা, "গুলিস্তান এলাকার দোকানদার, পকেট-মার, ছিনতাইকারী, কালোবাজারী, থানা-পুলিশ সবাই তাকে চেনে, ভয়ও পায়। কারণ ঠাণ্ডু সরকারি পার্টিতে যোগ দিয়েছে, মন্ত্রীর সঙ্গে মাখামাখি, রাষ্ট্রপতিও নাকি তাকে মাঝেমধ্যে ডাক দেয়" (মঞ্জু, ১৯৯০ : ৪৯)। ফুটপাতের হকার থাকাকালে 'পুলিশ ও বৈরী প্রকৃতির' কারণে বারবার ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ হতে হতো তাকে। কিন্তু হকার্স মার্কেটে দোকান নেওয়ার পরও তার মন থেকে উচ্ছেদের ভয় দূর হয় না। কারণ নতুন দোকান থেকে যে-কোনো সময় মার্কেটের সরকার-সমর্থিত সভাপতি ঠাণ্ডু যেমন তাকে উচ্ছেদ করতে পারে, তেমনি ক্ষমতার পালাবদল হলে মার্কেটের পরবর্তী নেতৃত্বও তাকে দোকানচ্যুত করতে দ্বিধা করবে না। বাচ্চুর জীবনে

বিপর্যয় নেমে আসে যখন চাঁদা দেওয়ার সময় সে মার্কেট কমিটির ক্যাশিয়ারকে হাসতে হাসতে বলে ফেলে :

> চাঁদার টাকায় আপনাদের খালি ভুঁড়ি ফোলে, ইলেকট্রিক বিলের লাখ লাখ টাকা পইড়া থাকে কেন? মানুষ মেলা কথা কয়, ওস্তাদরে কন না, একটা মিটিং ডাইকা বছরের হিশাবটা সবারে দিয়া দেউক। (মঞ্জু, ১৯৯০ : ৫৪)

বাচ্চু ভুলে গিয়েছিল যে সে ঠাণ্ডুদের মতো আধিপত্যশীল উচ্চবর্গের অধীন সামান্য নিম্নবর্গ। ঠাট্টাচ্ছলেও উচ্চবর্গের দুর্নীতির কথা বলাটা ক্ষমতাবান উচ্চবর্গের কাছে অপমানজনক ও গর্হিত কাজ। তাই শেষপর্যন্ত ঠাণ্ডুদের রোষানলে পড়ে তাকে দোকান থেকে উচ্ছেদ হতে হয় এবং ঠাণ্ডুর সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণে হতে হয় রক্তাক্ত। মঞ্জু সরকারের 'আমৃত্যু আকালু' ভূমিহীন উদ্বাস্তু দিনমজুর আকালুর জীবনের মর্মান্তিক উপাখ্যান। গল্পটি প্রকরণগত দিক থেকেও অভিনব। এই গল্পে প্রবন্ধসদৃশ বিভিন্ন উপশিরোনামের মাধ্যমে কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নদী-ভাঙনের ফলে সর্বস্ব হারিয়ে আকালু বাঁধসংলগ্ন স্থানে ঘর তোলে সস্ত্রীক বসবাস করে। তবে রাতে বাঁধের উপরে ঘুমাতেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এক "মধ্যরাতে অচেনা দুই পথিক আকালুর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে, ফিসফাস স্বরে আকালুর কাছেই জানতে চায়, আকালুর বউ কোন ঘরে থাকে?" (মঞ্জু, ২০০১ : ১৪৫) সহজ-সরল আকালুকে এই অপরিচিত দুই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে এবং আকালুর সামনেই পানি খাওয়ার ছলে তার স্ত্রী তিস্তা বিবির সম্ভ্রমহানির উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু তিস্তা বিবির সাহসী প্রতিরোধের কারণে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বিভ্রান্ত-বিহ্বল আকালুকে নিষ্ক্রিয়তা ও হঠকারী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করায়, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে আকালু। এরপর আত্মরক্ষাকামী স্ত্রীর ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে গিয়ে আকালুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়–যা নিম্নবর্গের বিপন্নতার ভিন্নতর দিককে পরিস্ফুট করে। আকালুর আচরণে আমরা নিম্নবর্গের সেই পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বকে আবিষ্কার করি, যারা সমাজের সবার কাছ থেকে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয়ে তাদের সমস্ত আক্রোশ প্রয়োগ করে স্ত্রীর ওপর। আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গের অন্যায় এরা সহ্য করে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার জন্য, কিন্তু স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত যুক্তিও এদের কাছে অসহনীয়। ফলে আকালুর মতো নিরীহ মানুষও নির্দ্বিধায় স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে। তবে সংগ্রামী ও প্রতিবাদী না হওয়ার ফলে এরা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

'আমৃত্যু আকালু' গল্পের আকালুর মতো 'নরকবাস' গল্পের সদর আলীও নদী ভাঙনের শিকার উদ্বাস্তু দিনমজুর। প্রথমে নদীর বাঁধের উপর ঘর তুললেও পরে গ্রামের দূর সম্পর্কের প্রভাবশালী আত্মীয় 'কসের দেওয়ানী'র সহায়তায় তারা ঘর বাঁধে মাশানকুড়া নামক দুর্গম স্থানে। কিন্তু সদর আলীর মতো অসহায় নিম্নবর্গকে কসের দেওয়ানীর মতো শোষক উচ্চবর্গ বিনা স্বার্থে কখনই যে সাহায্য করে না, তা প্রমাণিত হয় যখন কসের দেওয়ানী বিভিন্ন অজুহাতে সদর আলীর স্ত্রী সখিনার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়তে চায়। সদর আলী ও সখিনা কসের দেওয়ানীর অসৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরে প্রতিবাদ করলেও, এই প্রতিবাদের কারণেই তাদেরকে ভোগ করতে হয় মর্মান্তিক পরিণতি। গল্পের শেষ প্রান্তে রাতের অন্ধকারে একদল অজ্ঞাত উচ্ছৃঙ্খল তরুণ দ্বারা ছদর-আলীর লাঞ্ছিত হওয়া এবং স্ত্রী-কন্যার ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা

থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, এই ঘটনার নেপথ্যে কাজ করেছে কসের দেওয়ানীর মতো কপট উচ্চবর্গের প্রতিশোধস্পৃহা ও ক্ষমতার অপব্যবহার।

নিম্নবর্গের নারী : নিরাপত্তাহীন ও নিপীড়িত মানুষের কথকতা

আমাদের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রায় সকল নারীই পুরুষের সঙ্গে তুলনায় নিম্নবর্গ। ফলে নিম্নবর্গের পুরুষের স্ত্রী-কন্যা-মাতা একদিকে যেমন সমাজের উচ্চবর্গের তুলনায় অধস্তন, তেমনি পরিবারের পুরুষদের কাছেও অবহেলিত। এসব নারী অধিকাংশই আর্থ-সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন ও পুরুষতন্ত্রের নানামাত্রিক অনুশাসনে নিপীড়িত-নির্যাতিত। মঞ্জু সরকারের 'কার্তিকের অতিথি' গল্পে মনতাজের মেয়ে আছিয়া, 'আবরণ' গল্পের 'রুপালীর মা' উচ্চবর্গের কাছে সম্ভ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে মঙ্গাকালীন দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়ে। কিন্তু 'নগ্ন আহ্বান' গল্পে ধর্ষকামী পুরুষদের লালসার কারণে নিম্নবর্গের নারী হাজেরাকে বারবার তার সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে। এই গল্পের স্বামী পরিত্যক্তা যুবতি হাজেরা শহরে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় পাড়ার মাস্তানদের কুদৃষ্টির কারণে তাকে প্রতিনিয়ত বিব্রত হতে হয়। প্রতিমুহূর্তের সাবধানী পদক্ষেপে মাস্তানদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও রাতের অন্ধকারে গৃহকর্তার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ধর্ষিত হয়ে গৃহকর্তার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে তাকে রাতেই রাস্তায় নামতে হয় এবং টহলপুলিশের দ্বারা পুনরায় ধর্ষিত হতে হয়। ফলে তথাকথিত সভ্য পুরুষের পাশবিক আচরণের প্রতি ঘৃণায়-প্রতিবাদে, "সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনার সহস্র চিহ্ন আর বিক্ষুব্ধ চেতনায় শতাব্দীর প্রাচীন হাহাকার নিয়ে হাজেরা উলঙ্গই থেকে যায়" (মঞ্জু, ২০০৯ : ৫৭) বস্তুত হাজেরার এই নগ্নতা দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক উচ্চবর্গীয় সমাজের নারীনির্যাতনের প্রতি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদকেই প্রকাশ করেছে।

গৃহপালিত গাভীর প্রতি নিম্নবর্গের নারীর সন্তানসম বাৎসল্যের রূপায়ণ লক্ষ করা যায় 'গো-জীবন' গল্পে। এই গল্পের নিম্নবর্গের নারী ঘুতুর মা গ্রাম্য বিধবা। একমাত্র ছেলে ঘুতু ও পুত্রবধূর সংসারের খরচ মেটাতে গিয়ে তার সম্পত্তির সর্বাংশ বিক্রি করতে হয়েছে। এই বৃদ্ধা তার 'নালটি' নামের পোষা গাভীকে কন্যার মতো স্নেহ করে। ঘুতুর মার এই বাৎসল্যপ্রেমের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৮–১৯৭৬ খ্রি.) 'মহেশ' গল্পের মিল পাওয়া গেলেও গল্পের পরিণতিতে ঘুতু কর্তৃক গোপনে নালটিকে বিক্রি করে দেওয়ার পর ঘুতুর মার আত্মহত্যা এবং গল্পের নামকরণ থেকে যে আয়রনির সৃষ্টি হয়, তা থেকে বলা যায় যে গল্পকার ঘুতুর মার নারী-জীবনকে গো-জীবনের সঙ্গে প্রতিতুলনা করতে চান। এ বিষয়ে সমালোচক ভীষ্মদেব চৌধুরীর বক্তব্য :

> হাজীর ধানখেতে প্রবেশের শাস্তিস্বরূপ খোঁয়াড়বাস শেষে ঘুতু-কর্তৃক হাজীর কাছেই বিক্রি করে দেওয়ার মধ্যদিয়ে নালটির গো-জীবনের যে রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে, তারই সমান্তরালে গ্রীষ্মের মঙ্গায় তাপিত-উদর ঘুতুর মার নালটির বিনিময়মূল্যে কেনা নতুন শাড়িকে উদ্বন্ধন-রজ্জুতে পরিণত করে মর্মান্তিক আত্মহনন গো-জীবনের এক প্রতিরূপক-জীবনকে প্রতিভাসিত করে। এভাবেই রূপকার্থের ব্যঞ্জনা আর আয়রনির শাণিত লক্ষ্যভেদে গল্পোক্ত যুগল-জীবনধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৩৮৮)

মঞ্জু সরকারের 'গৃহবন্দীর ঘর-দুয়ার' গল্পে স্বামীর অযত্ন-অবহেলার জন্য গর্ভবতী নারীর দুর্গতির চিত্রউন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পে রংপুর জেলার হরিরামপুর গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর হেলেনা চার

সন্তানের জননী হওয়ার পরও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ না করে আরো একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করে। কিন্তু গর্ভবতী নারী হিসেবে স্বামী মেহের আলীর কাছে প্রত্যাশিত যত্ন ও সেবা হেলেনা কখনোই পায়নি। গর্ভাবস্থায় তার "মনে পড়ে গত বছরের কথা, কোলেরটা হওয়ার সময় হেলেনা মরতে বসেছিল, এক ফোঁটা অষুধ এনে দেয়নি মানুষটা" (মঞ্জু, ২০০৯ : ৩৮)। অভাবের সংসারে আরেকটি সন্তানের আগমনবার্তা দরিদ্র স্বামী-স্ত্রীর কাছে দুঃসংবাদ হয়ে আসে। নিজেরাই যখন ঠিকমতো খেতে পারে না, সেখানে নতুন সন্তানের ভরণপোষণের বাড়তি দায়িত্ব পালনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তারা সজাগ। ফলে তারা হেলেনার গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে গর্ভপাত ঘটানোর সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে গ্রাম্য ধাই বাতাসীর মার পরামর্শে একখণ্ড সূচালো বাঁশের কাঠি তলপেটে ঢুকিয়ে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণে মৃত্যুর পথে ধাবিত হতে হয় হেলেনার মতো নিম্নবর্গের নারীকে। স্বামীর অযত্ন-অবহেলা ও দায়িত্বহীনতায় নিম্নবর্গের নারীকে যে মর্মন্তুদ পরিণতি বরণ করতে হয় তার চিত্রই গল্পটিতে রূপায়িত হয়েছে। *পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'পাখির মা' গল্পে নাগরিক নিম্নবিত্ত নারীর জীবনসংগ্রাম ও বহুমাত্রিক সংকটের চিত্র বিন্যস্ত হয়েছে। এই গল্পের পাখির মা তার আট বছরের মেয়ে পাখি ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে শহরের বস্তিতে থাকে। গ্রাম থেকে শহরে আসা এই নারী হোটেলের রান্নাঘরে মশলা বাটার কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে খুব কষ্ট করে তাদেরকে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু পুলিশবাহিনী তাদের বস্তি উচ্ছেদ করে দিলে এবং পাখির মা তার চাকুরি থেকে ছাঁটাই হলে তারা গভীর সংকটে নিপতিত হয়। কর্মহীন উপার্জন-অক্ষম পাখির মার সংকট দেখে তার বৃদ্ধা মা গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু সংগ্রামশীল পাখির মা হতাশার মধ্যেও আশাবাদে অবিচল আস্থা স্থাপন করে তার মাকে বলে :

> অতো চিন্তা করস ক্যান মা? হাত দুইডা তো আর যায় নাই। ঢাকা টাউনে যতো হোটেল বাসা বাড়ি আছে, কামের বেটি ছাড়া চলব কারো? এতো দালান-কোঠা হইতাছে–আমরা কাম না করলি উঠবো? হোটেল-বাসাবাড়ির কাম না পাই যুদি, ইঁটা ভাঙ্গার কাম করুম। (মঞ্জু, ১৯৮৬ : ৭৮)

পাখির মার উপরিউক্ত উক্তির মধ্যে আমরা একজন সংগ্রামী ও আশাবাদী নিম্নবর্গের নারীকেই আবিষ্কার করি। পাখির মার মতোই সংগ্রামী ও সাহসী নারীকে আমরা খুঁজে পাই 'আমৃত্যু আকালু' গল্পের তিস্তাবিবি ও 'টুকির মায়ের পুলিশ জামাই' গল্পের টুকির মায়ের চরিত্রে। উভয় নারীই গ্রামীণ সমাজে প্রতিকূল পরিবেশে জীবন-সংগ্রামে অবিচল, অন্যায়ের প্রতিবাদে দৃঢ়কণ্ঠ ও জীবনসংগ্রামে অনমনীয়। মঞ্জু সরকারের গল্পসমূহের বিভিন্ন দুর্বলচিত্ত অসহায় নারীর তুলনায় সংগ্রামী-সাহসী-প্রতিবাদী এই দুই নারী নিঃসন্দেহে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও ব্যতিক্রম। মঞ্জু সরকার সৃষ্ট আরেকজন ব্যতিক্রমী নারী 'দুধওয়ালীর পুষ্টি উৎস' গল্পের হাদির মা। বিধবা এই নারী গ্রামে বসবাস করলেও গ্রাম থেকে দুধ কিনে শহরে গিয়ে বিক্রি করে সংসার চালায়। ছেলে হাদিকে চাকুরি দেবে এমন আশ্বাসে তার পরিচিত এক মেমসাহেবের বাসায় কন্যা হনুফাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে দেয় হাদির মা। সেই বাসার গৃহকর্তার দ্বারা মেয়ে হনুফা অসম্মানিত হয়ে বিতাড়িত হওয়ার পর অপমানিত হাদির মার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠলেও শেষ পর্যন্ত শুভবোধের কাছে পরাজিত হয় তার অন্তর্গত অশুভ চেতনা। ছেলে হাদির পরামর্শে বিক্রীত দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে গৃহকর্তার পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেও শেষ পর্যন্ত সেই গৃহকর্তার নিষ্পাপ শিশুপুত্রের কথা মনে করে তিনি দুধের ভেতর বিষ মেশানো থেকে বিরত থাকেন। সুযোগ পেয়েও অশুভ উপায়ে প্রতিশোধ নেওয়ার পথ থেকে ফিরে আসার প্রবণতা হাদির মার চারিত্রিক দৃঢ়তাকেই প্রকাশ করে।

মঞ্জু সরকারের 'ভিতরে মানুষের কান্না' গল্পে শহরের বস্তিবাসী বৃদ্ধা কদবানুর অসহায়ত্বের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কারখানার বহুতল ভবন ভেঙে পড়ার কারণে কদবানুর পুত্র গার্মেন্টস শ্রমিক আকবরের মৃত্যু ঘটে। কদবানুর এই বিপদে গ্রাম থেকে তার মেয়ে-জামাই ওকিজুদ্দি ছুটে এলেও–তার আগমনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল আকবরের মৃত্যুর জন্য মালিকপক্ষের তরফ থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ করার দুরভিসন্ধি। কিন্তু সেই টাকা না পেয়ে ওকিজুদ্দি তার শ্যালিকা জয়গুনকে নিয়ে যখন নিখোঁজ হয়ে যায়, তখন আমরা কদবানুর মতো বৃদ্ধার জীবনের বিপন্নতার মর্মভেদী চিত্রকেই প্রত্যক্ষ করি। মঞ্জু সরকারের 'মরা নদীর ময়না' গল্পে আমরা ময়না নামের এক স্বামী পরিত্যক্তা গ্রাম্য নারীর জীবনসংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করি। এই গল্পের নিম্নবর্গের নারী ময়নার স্বামী মঙ্গার সময় শহরে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরে আসে না। তাই সাত-আট বছর বয়সি সন্তান, বৃদ্ধা মা ও নিজেকে বাঁচাতে ময়না বাধ্য হয়ে দোকান দেয়। ময়নার ধারণা হয়তো তার স্বামী শহরে গিয়ে আরেকটি বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছে। ময়নার একাকিত্বের সুযোগে শহর থেকে বেড়াতে আসা রহস্যময় ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারিত করতে চায়। কিন্তু ময়নার দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত এই শহুরে প্রতারককে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হতে হয়। ময়নার মধ্যেও আমরা একজন নিম্নবর্গের নারীর জীবনসংগ্রামের শিল্পিত রূপায়ণ লক্ষ করি।

নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ

নিম্নবর্গের অধীনতার মধ্যেই যুগপৎভাবে 'সহকারিতা' ও 'প্রতিরোধ' ক্রিয়াশীল থাকে। সহকারিতা ও প্রতিরোধ প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ বলেন :

> [...] নিম্নবর্গের ইতিহাসে দুটি রাশিই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, যদিও অবস্থাভেদে একটি অপরটির চেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে এবং অধীনদের চৈতন্যে হয় একটি বা অন্যটি প্রাধান্য কায়েম করে সাময়িকভাবে। তাই একথা মনে করা ভুল হবে যে প্রতিরোধই নিম্নবর্গের চৈতন্যের একমাত্র উপাদান। বরং অসাম্য সত্ত্বেও যেহেতু সমাজ সাধারণত স্থিতিশীল তাই অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে সহকারিতাই প্রতিরোধের চেয়ে সাধারণত বেশি শক্তিমান। (রণজিৎ, ২০০৮ : ৪৩)

যেহেতু নিম্নবর্গের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের অধীনতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রতিবাদের বীজ, তাই নিম্নবর্গের এই প্রতিবাদ উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবেও হতে পারে, আবার পরোক্ষ প্রতিবাদেও পাওয়া যেতে পারে তাদের প্রতিরোধের আভাস। মঞ্জু সরকারের 'কানাইয়ের স্বর্গযাত্রা' গল্পে নরসুন্দরের পেশায় নিয়োজিত কানাইয়ের আচরণেও পরিস্ফুট হয়েছে উচ্চবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গল্পের 'বছির ধনী' কানাইয়ের কাছ থেকে চুল কাটিয়ে নেওয়ার পর বিভিন্ন অজুহাতে পয়সা না দেওয়ার চেষ্টা করলে কানাই "প্রায় হুকুম ছুঁড়ে দেওয়ার মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলে–'পয়সাটা এলায় নিয়া আইসেন কাকা'।"(মঞ্জু, ২০০৯ : ৪৫) কিন্তু প্রতিউত্তরে বছির ধনীর কাছ থেকে চপোটাঘাত পেয়ে অপমানিত কানাই ক্ষোভে-দুঃখে শেষ পর্যন্ত পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে কল্পিত স্বর্গ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে নতুন পেশা গ্রহণ করে নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য। 'নগ্ন আহ্বান' গল্পে তথাকথিত সভ্য পুরুষদের দ্বারা বারবার ধর্ষিত হয়ে নগ্ন থাকার মাধ্যমেই হাজেরা প্রকাশ করেছে তার ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ। তবে *অবিনাশী আয়োজন* গ্রন্থের নাম গল্পটি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই গল্পে আমরা শোষিত নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে আশাবাদী ও স্বপ্নচারী মঞ্জু সরকারকে আবিষ্কার করি। ফেলু কামারকে উপলক্ষ্য করে কার্তিকমাসী মঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুৎপিপাসাকাতর মানুষের সামষ্টিক শক্তিতে রূপান্তর এবং ক্ষুধার্তের খাদ্যভান্ডার

দখল করে রাখা সেরাজ চৌধুরীর মতো শোষকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের প্রস্তুতিকেই মঞ্জু সরকার 'অবিনাশী আয়োজন' শিরোনামে দ্যোতিত করেছেন। মঙ্গাজীর্ণ খরার মৌসুমে গভীর নলকূপবাহিত সেচব্যবস্থার মাধ্যমে, ইরিধান চাষের সরকারি প্রকল্পের ফাঁকফোকর দিয়ে, গ্রামের গরিব কৃষককে অনেক সময় মহাজন-জোতদারের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হতে হয়। 'দহন' গল্পে এ ধরনের ষড়যন্ত্রে নিঃস্ব হওয়ার আগেই বরকতুল্লাকে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখা যায়। গল্পের শেষপ্রান্তে নিষ্ঠুর-নির্দয় শোষকের অন্যায়ের প্রতিবাদে বরকতুল্লা কর্তৃক দেওয়ানীকে কোদাল দিয়ে আঘাত করার পর দেওয়ানীর লোকজনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিঃসঙ্গ বরকতুল্লার সঙ্গে তার নয়-দশ বছরের ছেলে বেলালের শামিল হওয়া নিম্নবর্গের প্রোজ্জ্বল প্রতিরোধ চেতনাকে প্রকাশ করেছে। মঞ্জু সরকারের 'উপেক্ষিত দুইজন' গল্পের নিম্নবর্গের চরিত্র গোমাকেও আমরা আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেখি। এই গল্পে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী রহিম ব্যাপারী ক্ষমতার দাপটে পেয়ার আলী মাস্টারের পাঠাগার কক্ষ দখল করে পাটের আড়ত বানায়। রহিম ব্যাপারীর মতো ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে পেয়ার আলী মাস্টারের মৌখিক প্রতিবাদ কোনো ফল বয়ে আনে না। তাই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে রহিম ব্যাপারীর মতো কুটিল মানুষকে শায়েস্তা করার গোপন পরিকল্পনা করে নানা পেয়ার আলীকে আশ্বস্ত করে গোমা : "মুই আইজ রাইতের মধ্যে হারামজাদা ব্যাপারীর কোষ্টার গুদামত আগুন জ্বালে দিম!" (মঞ্জু, ২০০৯ : ৪৮) বস্তুত উচ্চবর্গের দ্বারা বারবার উপেক্ষিত হতে হতে পেয়ার আলী ও গোমার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে ক্ষোভ ও হতাশা জমা হয়েছিল–তাই তাদেরকে সরবরাহ করেছে প্রতিরোধের গুপ্ত অগ্নিবীজ। 'রাজবন্দীর বোধশোধ' গল্পের শাদুল্লা বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে অবচেতন মনে থুতু ফেলে প্রকাশ করেছে তার প্রতিবাদ। অবশ্য এই থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত মারামারির কেসে আসামি হয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভয়ে তাকে বাড়ি থেকে পালাতে হয়।

মঞ্জু সরকারের 'বিচূর্ণ প্রতিবিম্ব' গল্পের হারাণ নাপিতের পেশায় নিয়োজিত একজন গ্রামীণ নিম্নবর্গ। "নাপিতকুলের মধ্যে হারাণই যে শ্রেষ্ঠ গরিব, সেটা তার চেহারা ও বেশভূষা দেখেই অনুমান করা বেশি সহজ" (মঞ্জু, ২০০১ : ৭১-৭২)। অর্থনৈতিক দীনতার জন্যই মুক্তহাটে ঘরভাড়া করে সেলুন দেওয়ার বদলে হাটের পাশে রাস্তায় কড়ই গাছের গোড়ায় বড় আয়না সাজিয়ে, চেয়ার বসিয়ে সেলুন বানাতে হয় হারাণকে। অন্যদিকে মুক্তহাটে ঘর ভাড়া করে সেলুন দেওয়া শ্যামল পেশায় নাপিত হলেও অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিবেচনায় হারাণের তুলনায় উচ্চবর্গ। গল্পে প্রতিদ্বন্দ্বী হারাণের উন্মুক্ত সেলুন ভেঙে ফেলার কারণে হারাণ শ্যামলের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ঠিকই কিন্তু শ্যামলের পেশিশক্তির আধিপত্যে উল্টো তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। এভাবেই শ্যামলের মতো উচ্চবর্গের পেশিশক্তির দাপটে চাপা পড়ে যায় নিম্নবর্গের প্রতিরোধ চেতনা।

নিম্নবর্গের অবক্ষয় ও অপরাধপ্রবণতা

মঞ্জু সরকারের গল্পগুলোতে আমরা অবক্ষয়ী-অপরাধপ্রবণ নিম্নবর্গেরও সন্ধান পাই। তবে এই চরিত্রগুলো স্বেচ্ছায়-সচেতনভাবে অপরাধপ্রবণ নয়। তাঁর গল্পগুলোতে নিম্নবর্গের দুর্ভিক্ষশীর্ণ মানুষ, অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়। তাঁর মঙ্গাপীড়িত চরিত্রগুলো ক্ষুধার

যন্ত্রণায় মিথ্যা কথা বলে, অন্যকে ঠকিয়ে লাভবান হতে চায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে, পিতার সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য। যেমন 'দুর্গত অঞ্চলের দেবতা' গল্পের নঈমুদ্দি প্রতারণা করে গ্রাম্য মহিলাদের তার দোকানের দ্রব্য বিক্রি করতে চায় দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার প্রয়োজনে। 'দুশমন' গল্পের হবিও পিতার টাকা চুরি করার চেষ্টা করে একই কারণে। 'রাঘব বোয়ালের খাদ্য' গল্পের ওসমানও মৃত স্ত্রীর কাফনের কাপড় কেনার জন্য সাহায্য তুলে কিন্তু কাফন ছাড়াই স্ত্রীকে কবর দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালায়। 'দানেশের দেশবিদেশ' গল্পের দানেশ দুর্দিনের আশ্রয়দাতার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। এছাড়া আছিয়া এবং রুপালির মার মতো নারীকে লক্ষ করি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকার জন্য এরা বাধ্য হয়ে এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়লেও এরা কেউই পেশাদার অপরাধী নয়।

নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতার বিবিধ প্রসঙ্গ

মঞ্জু সরকারের বিভিন্ন গল্পে নিম্নবর্গের প্রচলিত বিশ্বাসে ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে। 'ভূতের সাথে যুদ্ধ' গল্পে মাছুয়া মফিজ মাছ ধরতে গিয়ে ভূত দ্বারা আক্রান্ত হয়। মফিজের অসুস্থ স্ত্রীকে ভূতে ধরেছে বলেই সে বিশ্বাস করে। এছাড়া এই গল্পে মফিজের মেয়ে জমিরন ভূতের ভয় দেখিয়েই তার ক্ষুধার্ত ছোটো ভাইয়ের কান্না থামায়। 'আমৃত্যু আকালু' গল্পের গপ্পোবুড়োর গল্পের মধ্যেও ভূতের প্রসঙ্গ এসেছে। 'প্রিয় দেশবাসী' গল্পে আমানুল্লার নাতিরা ভূতের প্রতি যেমন বিশ্বাসী তেমনি আজরাইল ফেরেশতার অস্তিত্বেও আস্থাশীল। এছাড়া মঞ্জু সরকারের বিভিন্ন গল্পের নিম্নবর্গকে জ্বিন-পরির মতো শক্তিশালী জীবের প্রতিও বিশ্বাসী হতে দেখি। বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গের মানুষের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক আচরণ মঞ্জু সরকারের 'আনন্দযাত্রা' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এই গল্পে কনের বাড়ি থেকে ফেরার সময় বরযাত্রীদের বাস মাঠে আটকে যাওয়ার পর সবাই মিলে চেষ্টা করেও সেই জায়গা থেকে নড়াতে পারে না। ফলে গ্রামবাসীরা স্থির সিদ্ধান্তে আসে যে "বাসের ওপর জ্বিনের আসর পড়ছে" (মঞ্জু, ১৯৯৫ : ৮৩)। এভাবে মঞ্জু সরকারের বিভিন্ন গল্পে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে নিম্নবর্গের মানুষের যে দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়, তা নিম্নবর্গের জীবনাচরণেরই একটি অংশ।

মঞ্জু সরকারের গল্পে যেসব নিম্নবর্গের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাব নিম্নবর্গের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক মাপকাঠি। এরা কথা বলার সময় প্রমিত বাংলায় কথা না বলে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যে-কোনো ধরনের অপভাষা বা অশিষ্ট ভাষা (Slang) প্রয়োগেও জড়তা অনুভব করে না। তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষগুলো কথা বলার সময় তাদের আঞ্চলিক সংলাপ ও লোকায়ত শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার ঘটিয়েছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গল্পের চরিত্রসমূহ নির্দ্বিধায় অপভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর গল্পে প্রকরণ-পরিচর্যার চেয়ে নিম্নববর্গের জীবনের রূঢ় বাস্তবতার বিচিত্র দিকের তীক্ষ্ণমুখ প্রকাশই পেয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। গ্রাম ও শহর–উভয় অঞ্চলের নিম্নবর্গের জীবনকে উপজীব্য করলেও উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষের জীবনবাস্তবতা রূপায়ণে তিনি বিশিষ্ট ও অনন্য। এক্ষেত্রে তাঁর গল্পের যে বিষয়-বৈচিত্র্যও নান্দীযোগ্য। নিরীক্ষাপ্রবণ না হলেও নিম্নবর্গের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা (detail) মঞ্জু সরকারের গল্পকে

করেছে শিল্পোত্তীর্ণ। মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের জীবন রূপায়ণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি নিরাসক্ত-নির্মোহ থেকে শৈল্পিক সিদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। তাই মঞ্জু সরকারের এসব গল্প বাংলাদেশের নিম্নবর্গের জীবনভিত্তিক ছোটোগল্পকেও করেছে সমৃদ্ধতর।

সহায়কপঞ্জি

আনু মুহাম্মদ (২০০৪)। 'রংপুরের দুর্ভিক্ষ : ১৯৭৯'। *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০০৮)। 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। সম্পাদক : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৪১২)। 'দুর্ভিক্ষের শিল্পরূপ'। *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪১২। সম্পাদক : নাঈম হাসান।

মঞ্জু সরকার (২০০৯)। *অবিনাশী আয়োজন*। তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৯৫)। *আনন্দযাত্রা*। সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৯০)। *উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা*। রমা প্রকাশনী, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৮৬)। *পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প*। নিখিল প্রকাশন, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (১৯৮৬)। *মৃত্যুবাণ*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মঞ্জু সরকার (২০০১)। *যৌথ একাকিত্ব*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা।

মোঃ মেহেদী হাসান (২০০৮)। *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন*। মনন প্রকাশন, ঢাকা।

Dipesh Chakrabarty (2000). 'Minority Histories, Subaltern Pasts'. *Provincializing Europe (Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princton University Press, Oxfordshire.

Gayatri Chakravorty Spivak (1988). 'Can the Subaltern Speak?'. *Marxism and the Interpretation of Cultrue*.Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds). Macmillan, London.